চতুর্থ অধ্যায়

উপসংহার

উনবিংশ শতকের বিশ্বে অন্যতম দর্শনবিদ কার্ল মার্কস কমিউনিস্ট লিগের ইসতাহার লিখবার জন্য ১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' প্রকাশ করেন। তার ইংরাজি অনুবাদ 'দ্য রিপাবলিকান' পত্রিকা মারফৎ ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে ছড়িয়ে যায়। ভারতেও তা স্বাভাবিকভাবে পৌঁছায়। এই মতবাদ কিছু বুদ্ধিজীবী মহলের একাংশে সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে ১৯১৭-র অক্টোবর বিপ্লব অর্থাৎ লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লবের সাফল্য সেই সীমাবদ্ধ চেতনাকে প্রসারিত করল। মার্কসীয় রাজনীতির বিস্তারের ফলে মার্কসীয় চেতনারও প্রসার লাভ করল।

ব্রিটিশ ভারতের কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকশোষণ, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অতীতে অসংগঠিতভাবে হলেও ছিল। কিন্তু ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে এম. এন. রায় প্রমুখের নেতৃত্বে তাসখন্দে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯২৫-এ কানপুরে পার্টির প্রথম সম্মেলন থেকে ভারতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠনগত ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার হয়ে ওঠে সন্দিগ্ধ। ফলস্বরূপ কানপুর, মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় তৎকালীন কমিউনিস্ট কর্মীদের বন্দী হতে হয়। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকেও কমিউনিস্ট পার্টির বিভিন্ন গণফ্রন্ট তৈরি হয়। শ্রমিক কৃষকের পাশাপাশি তৈরি হয় ছাত্র, সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট। এই ফ্রন্টগুলির মাধ্যমেই কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচিগুলি রূপায়িত হতে থাকে। বিশেষ করে পার্টি নিষিদ্ধ (১৯৩৪-৪২) থাকাকালীন সময়ে ওইসব গণফ্রন্ট বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দাঙ্গা প্রভৃতি ঘটনায় তৎকালীন কমিউনিস্টদের কিছু বিতর্কিত, কিছু ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষ করা গেছে। এইসব বিস্তৃত কর্মধারা তৎকালীন উপন্যাসে নানাভাবে উঠে এসেছে।

যদিও উক্ত বিষয়গুলি বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

মার্কসীয় মতাদর্শের রোমান্টিক আবেগময় দিকটি ধরা পড়েছে বিশের দশকের শেষের দিকে লেখা নজরুল ইসলামের 'মৃতুক্ষুধা' উপন্যাসে। যদিও ওই সময়ে কমিউনিস্ট কর্মধারা বাংলায় সেভাবে বিস্তার লাভ করেনি। রুশ বিপ্লবের ইতিবাচক আবেগ তৎকালীন যুগে অনেকের মতো নজরুলকেও প্রভাবিত করেছিল। তাই তাঁর 'মৃতুক্ষুধা' উপন্যাসের নায়ক আনসারের মধ্যে মার্কসীয় কর্মকাণ্ডে সংযোগ ততটা আমরা লক্ষ করিনি যতটা আবেগকে লক্ষ করেছি। তবে নিম্নবর্গের মানুষদের জীবনধারা, জীবনবোধ, অনালোকিত জীবনে আলোকবিন্দু বিচ্ছুরণের প্রচেষ্টা প্রভৃতি ঘটনা মার্কসীয় রীতিকে ইঙ্গিত করেছে। বর্তমান গবেষণায় গোপাল হালদার, ধূর্জটিপ্রসাদের 'ট্রিলজি'-র মধ্যে আমরা পেয়েছি মার্কসীয় মতবাদের উপাদান। বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে লেখা গোপাল হালদারের 'একদা', 'অন্যদিন', 'আর একদিন' উপন্যাসে অমিতের বিবর্তনরেখার বিভিন্ন অংশে মার্কসীয় চেতনা দানা বেঁধেছে। একজন কমিটেড পার্টিসভ্যের তত্ত্ব আর অনুশীলনের দ্বিধারা বয়ে গেছে উপন্যাসের গতিতে। একই দশকের আর একজন ঔপন্যাসিক ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা' আবর্ত ও 'মোহানা' উপন্যাসত্রয়ীতে মার্কসীয় মতাদর্শের বহমনতাকে আমরা লক্ষ করেছি। অমিতের মতোই এই তিনটি উপন্যাসের নায়ক খগেনবাবুর আত্মউন্মোচনের স্তরকে আমরা দেখেছি। ধূর্জটিপ্রসাদ পার্টি সংশ্লিষ্ট ছিলেন না। ফলে তাঁর উপন্যাসে তত্ত্বচিন্তার দিকটা যতটা এসেছে ততটা আসেনি অনুশীলনের দিকটি। সোমেন চন্দের 'বন্যা' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে তাঁর কিশোর বয়সে। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে বড় হয়ে উঠেছে আবেগ।

বিগত শতাব্দীর চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধ অর্থাৎ ১৯৪২-৪৩ পর্বে বাংলা জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডব, আর দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা—এই দুই অভিশাপ বাংলার গ্রাম-শহরের মানুষকে মারাত্মক প্রভাবিত করেছিল। এরই প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'মন্বন্তর' উপন্যাসটি। তৎকালীন বামপন্থী রাজনৈতিক সংস্রব তাঁকে এই উপন্যাস রচনায় উৎসাহ দেয়, কিন্তু উপন্যাসটিতে মার্কসীয় চেতনা দানা বাঁধেনি। অবশ্য মার্কসবাদকে সেভাবে উপলব্ধিও করেননি তারাশঙ্কর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত থেকে উপন্যাস লিখেছেন। তাই লেখকজীবনের দ্বিতীয় পর্বে লেখা মানিকের 'চিহ্ন', 'স্বাধীনতার স্বাদ' উপন্যাস দুটিতে মার্কসীয় তত্ত্বচিন্তার সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কথাও উঠে এসেছে এখানে। তত্ত্বচিন্তা বা সমসাময়িক বাম-রাজনীতি উপন্যাসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শিল্পসম্মত ভাবেই। এই চল্লিশের দশকেই সুবোধ ঘোষ লিখেছেন 'তিলাঞ্জলি' এবং সতীনাথ ভাদুড়ী 'জাগরী'। এই দুটি উপন্যাসেই আছে মার্কসীয় রাজনীতির প্রতি সমালোচনা। সুবোধ ঘোষের ক্ষেত্রে এই

সমালোচনার পাশাপাশি মিশেছিল বিরাগ। আমাদের মনে রাখতে হবে, সব মানুষের রাজনৈতিক মতাদর্শ একই রকম হতে পারে না। বিশ শতকের তিন ও চারের দশকে গান্ধীজি পরিচালিত কংগ্রেসি আন্দোলনই ছিল সর্বাধিক। দেশের মানুষও ওই দেশাত্মবোধক রাজনীতিকে গ্রহণ করতে পারতেন সহজেই। মার্কসবাদী চেতনার আন্তর্জাতিক অভিমুখিনতা স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতীয়দের কাছে খুব বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাছাড়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের 'জনযুদ্ধ' নীতি সাধারণ মানুষের কাছে সুবোধ্য হয়নি। জাতীয়তাবাদী লেখক বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই মার্কসবাদকে সমর্থন করতেন না ও কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধী ছিলেন। কাজেই এই বিশেষ সময়ের কিছু উপন্যাসে মার্কসীয় চেতনার কিছু বিরুদ্ধ মতবাদ প্রাধান্য পাবে এটাই স্বাভাবিক। এই দিকটিকেও আমরা তিন ও চারের দশকের বাংলা উপন্যাসে মার্কসবাদী চেতনার প্রতিক্রিয়া হিসাবেই গণ্য করেছি। সেই সূত্রেই আলোচিত হয়েছে সতীনাথ ভাদুড়ী ও সুবোধ ঘোষের উপন্যাস।

প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষভাবে বাম-রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন লেখিকা সাবিত্রী রায়। তাঁর স্বামী শান্তিময় রায় ছিলেন তৎকালীন সময়ের কমিউনিস্ট পার্টির অগ্রণী নেতা। পরবর্তীকালে তিনি পার্টির সঙ্গ ত্যাগ করেন, কিন্তু মার্কসীয় মতাদর্শ থেকে দূরে সরে যাননি। এই প্রেরণা, ক্ষোভ, অভিমান পার্টি গড়ে ওঠার ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে লেখিকা সাবিত্রী রায়ের প্রথম উপন্যাস 'সৃজন'। এই উপন্যাস বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

এই চারের দশকেই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বেশ কিছু উপন্যাস লিখেছেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মার্কস অনুরাগী ছিলেন, বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী থাকলেও তিনি দলীয় রাজনীতি থেকে দূরে ছিলেন। তাঁর লেখায় সরাসরি মার্কসীয় রাজনীতি উঠে আসেনি, ইঙ্গিতে, আভাসে প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর প্রিয় মতাদর্শ। আলোচনায় আমরা তাঁর তিনটি উপন্যাসকে বেছে নিয়েছি—'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী', 'মন্দ্রমুখর' ও সূর্যসারথি' সংক্ষিপ্ত আলোচনায় সশস্ত্র বিপ্লবের কথা ফুটে উঠেছে এখানে। শ্রমিক কৃষকের সংঘবদ্ধ লড়াই-এর কথা উঠে এসেছে উপন্যাসগুলিতে। পরবর্তীকালে সেই পরম্পরাই আমরা লক্ষ করেছি।

এতক্ষণ সংক্ষেপে যে প্রসঙ্গগুলি আলোচিত হল তা বিস্তৃতভাবে গবেষণা সন্দর্ভে বিভিন্ন অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে। উপসংহারের শেষ অংশে আমরা উপন্যাসের এই ধারার বিবর্তনটি সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। ভারতের স্বাধীনতা এবং সেই সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও শরণার্থী সমস্যা দেখা দিল ভয়ঙ্করভাবে। পাঁচের দশকে দেশের প্রশাসনিক ক্ষমতা আসে কংগ্রেস দলের হাতে। এই সময় কিছু মার্কসীয় চিন্তাচেতনার গুরুত্ব কিছুমাত্র কম ছিল না।

বিশেষত পশ্চিমবঙ্গে প্রধান বিরোধী দলের ক্ষমতা থেকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি সবক্ষেত্রেই দাঁড়িয়েছিল বিপন্ন ও উৎপীড়িত জনগণের পাশে। মার্কসবাদে বিশ্বাসী নেতৃবৃন্দ ও সংগঠনগুলি অর্জন করেছিল যথেষ্ট রাজনৈতিক মর্যাদা। কাজেই পাঁচের দশকে সমরেশ বসু, গুণময় মান্না, সুলেখা সান্যাল, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বামপন্থী মতাদর্শের লেখকরা একাধিক উপন্যাস লিখেছেন। সেগুলিতে মার্কসীয় রাজনীতির ইতিবাচক চিত্র উঠে এসেছে। সেই ধারাতেই ছয়ের দশকে দেখা দিলেন মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য, তপোবিজয় ঘোষ এবং আরো কেউ কেউ।

ছয়ের দশকে মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে ভারতে এক অস্থিরতার কালপর্ব। চিন-ভারত যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দেখা দিল কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন। সেই বিভাজন আর জোড়া লাগেনি। দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই সময়ে বিভিন্ন দিক থেকে অনিশ্চয়তা ধারণ করছিল। তারই ফলস্বরূপ এই দশকটির শেষের দিকে নকশালবাড়ি আন্দোলনের উত্থান। সারা বাংলাদেশ তথা দেশের বুদ্ধিজীবী জনঅংশে এই আন্দোলন যথেষ্ট উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী অংশের ছাত্ররা জীবনের ভবিষ্যৎ ভুলে সেই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রথম বিদ্রোহ ১৯৬৭-তে। এখানে দেখা দিল কমিউনিস্ট পার্টির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এই মতানৈক্যের ভিত্তিতে তৃতীয় একটি কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হল ১৯৬৯-তে। তার ফলে সত্তরের দশকে আমরা দেখলাম মার্কসীয় রাজনীতি ও আন্দোলনকে নতুনভাবে উপন্যাসে বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে এলেন কয়েকজন লেখক। মহাশ্বেতাদেবী, সমরেশ বসু, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দের সঙ্গে যুক্ত হলেন শৈবাল মিত্র প্রমুখ। মহশ্বেতাদেবীর 'হাজার চুরাশির মা', সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শোকমিছিল', তপোবিজয় ঘোষের 'সামনে লড়াই' প্রভৃতি উপন্যাসে আমরা 'নকশাল' আন্দোলনের বিভিন্ন দিককে লক্ষ করেছি। শৈবাল মিত্রর 'অগ্রবাহিনী' উপন্যাসেও ওই সময়পর্বটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে।

মার্কসীয় মতাদর্শ রাজনৈতিক দলীয়তা সাপেক্ষ কোনো ইস্তাহার নয়। এই মতাদর্শকে বলা যায় সামাজিক-অর্থনৈতিক একটি তত্ত্ব—যা মানবসভ্যতার অস্তিত্বের দর্শনকেও প্রভাবিত করতে পারে। মানুষের জ্ঞানচর্চার ইতিহাসে এই তত্ত্ব কয়েকটি দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে যা চিরকালীন। যেমন প্রথমত মানবসভ্যতার শোষণ ভিত্তিক শ্রেণি সম্পর্কে সত্যতা, এই সত্যটি স্বীকৃত হয়েছে বলেই বর্তমান পৃথিবীতে নিম্নবর্গের অধ্যয়ন এতটা প্রাসঙ্গিক ও দৃঢ়ভিত্তিক হতে পেরেছে। বর্তমান পৃথিবীর যাবতীয় উন্নয়ন ধারণা এবং অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম আজও একান্তই মানুষের ক্ষমতায়নের উপর নির্ভরশীল। মার্কসীয় তত্ত্ব উচ্চারিত হয়েছিল বলেই

পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ বহু প্রশ্নের এবং আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। আর তার ফলেই কল্যাণকামী রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল। আর এ-কারণেই বলা যায় মার্কসীয় তত্ত্বের নির্যাস সাহিত্যে প্রেরণা হিসেবে চিরকালই কাজ করবে।

মার্কসবাদের তত্ত্বকে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করা হয় তখন তার কোনো সুচিন্তিত রূপরেখা মার্কসের লেখায় পাওয়া যায়নি, কারণ মার্কসকে সে-রকম কোনো রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে যেতে হয়নি। রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তিই হল ক্ষমতায়নকে ব্যবহার করা এবং যথাযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করা। মার্কসীয় তত্ত্বকে এই ধারণার সঙ্গে মেলানো প্রায় অসম্ভব। অতএব প্রয়োজন দেশকালের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে এই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগ নির্ধারণ করা এবং সামাজিক প্রগতির ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বারবার তার পরিমার্জন করা। কিন্তু রাজনীতির যে প্রথাসিদ্ধ কাঠামো সেখানে এতটা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিসর দেওয়া খুবই কঠিন। এই কারণে মার্কসীয় তত্ত্ব ও মতাদর্শ অনেকটাই কাজ করে যে-কোনো রকম ক্ষমতায়নের প্রতিষেধক রূপে। এই কারণেই সাহিত্যিকদের মননে মার্কসীয় মতাদর্শ কোনোদিন মূল্যহীন হয়ে যাবে না। বিশ শতকের নয়ের-এর দশক পর্যন্ত এই মতাদর্শকে ভিত্তি করে সাহিত্য রচিত হতে দেখেছি। এমনকি ২০০৭ খ্রিস্টাব্দেও কিন্নর রায়ের 'মৃত্যুকুসুম' এবং অশোক মুখোপাধ্যায়ের ২০১২ খ্রিস্টাব্দের অন্যতম একটি উপন্যাস 'আটটা নটার সূর্য'তে নকশালবাড়ি আন্দোলন প্রসঙ্গ কথারূপ পেয়েছে। কাজেই মার্কসীয় আদর্শের স্থানটি সাহিত্যের অঙ্গন থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। এই ধারা কোনো-না-কোনো আকারে অবয়ব লাভ করবে।